জেলায় জেলায় শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে প্রচার অভিযান - বহু বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান

২০১০ সালের ১ এপ্রিল থেকে সারা দেশে বিনাব্যায়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের এই আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী প্রকাশ করেছে গত ১৬ মার্চ, ২০১২। আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত বেশ কিছু বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে। বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। এখনও বহু শিশু বিদ্যালয়ের আঙ্গিনার বাইরে

এ বছরও গ্রাম স্তরে প্রচারের সময় বহু বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ৪টি ব্লকের (রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, করণদিঘি) অন্তর্গত মোট ৪১ টি গ্রামে প্রচারের সময় ২৪টি গ্রামে ১৯০ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আশার কথা ১৭টি গ্রামে কোনো বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

হুগলি জেলার ২টি ব্লকের (চন্ডীতলা–১, চন্ডীতলা–২) ৫টি গ্রামে প্রচারের সময় মোট ৩৩ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২০টি ব্লকের (এগরা–১, এগরা–২, ভগবানপুর–১, ভগবানপুর–২, হলদিয়া, নন্দীগ্রাম–১, নন্দীগ্রাম–২, দেশপ্রাণ, রামনগর–১, রামনগর–২, কাঁথি–১, কাঁথি–৩, খেজুরী–১, খেজুরী–২, নন্দকুমার, ময়না, পাঁশকুড়া, চন্ডীপুর, মহিষাদল, তমলুক) ৭২টি গ্রামে মোট ১৬৭ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়।

মালদহ জেলার ৬টি ব্লকের (কালিয়াচক – ইংলিশ

সমস্পর্তা

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৩

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

বাজার ওল্ড মালদহ, কালিয়াচক–১, কালিয়াচক–২, ইংলিশ বাজার) ১৬ টি গ্রামে প্রচারের সময় ৯৬ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। ৯৬ জন শিশুর মধ্যে ৮৪ জল শিশুর বয়স ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং ১২ জন শিশুর বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে।

বর্ধমান জেলার ৫টি ব্লকের অন্তর্গত ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ১৫টি গ্রামে প্রচারের সময় ১১টিতে ৫৪ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর *শেষাংশ ৮ পাতায়*

শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়। ৩৩ জন শিশুর মধ্যে ২৩ জন শিশুর বয়স ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং ১০ জন শিশুর বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে।

বাঁকুড়া জেলার ৩টি ব্লকের (ইন্দাস, পাত্রসায়র, ছাতনা) ৪টি গ্রামে মোট ৩৪ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর

রয়েছে। বিগত বছরে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক শিক্ষা অধিকার প্রয়োগ অভিযান, ২০১২ – এই প্রচারের সময় ৯টি জেলার ৬০টি ব্লকের অন্তর্গত ১২৯টি গ্রামে ১২১০ জন বিদ্যালয় ছুট শিশুর সন্ধান পেয়েছিল।

আইন যথাযথ প্রয়োগে সরকার ও প্রশাসনের সদিচ্ছার পাশাপাশি অভিভাবকদের সচেতনতারও প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে এবছরও গ্রামস্তরে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গ্রামস্তরে প্রচারের আগে স্বেচ্ছাসেবী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে কর্মশালা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। গ্রাম নির্বাচন, পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে আলোচনা, অভিভাবকদের সাথে সভা, পথসভা, প্রচারপত্র বিলি করা, পোস্টারিং, বিদ্যালয় সমীক্ষা, বিদ্যালয় ছুট শিশুদের তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রচার কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশুর উপযুক্ত স্থান হল বিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

শিক্ষা অধিকার আইন – বাস্তব প্রয়োগ কতটা

নতুন বছরের শুভেচ্ছা!

সারা দেশে শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ লাগু হওয়ার তিন বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আগামি ৩১ মার্চ, ২০১৩–এর মধ্যে সমস্ত রাজ্যে আইনটির যথাযথ প্রয়োগ হওয়ার কথা। তবে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গত তিন বছরে আইন প্রয়োগের যা যা উদ্যোগ দেখা গেছে, সেগুলি যে যথেষ্ট নয় এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ যে হয়না তার অনেক উদাহরণ আমাদের চোখে পড়েছে, বিভিন্নভাবে। ওয়েবেন সম্প্রতি একটি নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করেছিল, যার মাধ্যমে আমরা শতাধিক বিদ্যালয় ছুটের সন্ধান পেয়েছি এবং বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষা অধিকার আইন অনুসারে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার নমুনা সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি, সর্বনিম্ন সুযোগসুবিধাগুলি বিদ্যালয়গুলিতে নেই, এমনকি স্থানীয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এখনো সাম্প্রতিক কোনো উদ্যোগ বিশেষ চোখে পড়েনি, কারণ তাদের কাছে কোনো আদেশ/বিজ্ঞপ্তি নেই। ফলে তৃণমূল স্তরে শিক্ষার মান ও অবস্থা এখনও বেশ ভয়াবহ। এছাড়াও আছে জনমানসে এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ক্ষেত্রগুলিতে সচেতনতার অভাব। ওয়েবেন চেষ্টা করেছে গ্রামস্তরে নিবিড় প্রচারের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে আরো বেশি করে সচেতনতার প্রসার করতে। এর জন্য স্থানীয় প্রশাসন, গ্রামবাসী, স্বনির্ভর দলের সদস্য, শিক্ষকসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা ওয়েবেনকে নিজ উদ্যোগে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ওয়েবেন নিয়মিতভাবে শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের বেশ কিছু অভিযোগ সংগ্রহ করেছে, যার মাধ্যমে বাস্তব পরিস্থিতি আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিগুলিও জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, ফলে কোনো সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোও সম্ভব হচ্ছেনা। এছাড়াও বিদ্যালয়ে শাস্তি বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়া তা রোধ করতে এখনও কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি, তার উদাহরণ আমরা সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হওয়া শাস্তির ঘটনাগুলি দেখেই বুঝতে পারি।

শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি আজও যে উপেক্ষিত তাও আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পাই। নিয়মিতভাবে শিশু পাচার, শিশু নির্যাতন, শিশু মৃত্যু, পরিত্যক্ত শিশুর সন্ধান পাওয়া – এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে শুধু খবর মাত্র। শিশুরা শৈশব হারাচ্ছে, প্রতিনিয়ত তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে – এবং এইক্ষেত্রে সর্বস্তরের শিশুরাই সামিল, এর কোনো বিভেদ/বৈষম্য নেই।

আমরা কি একটুও ভাবব না!

মাননীয়
সম্পাদক
সমপথ
৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা – ৩১

সবিনয় নিবেদন,

একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে বর্তমানে পরিস্থিতিতে কিছু সমস্যার কথা আপনার পত্রিকায় তুলে ধরতে চাই। শুধু ঐ সমস্যাগুলি আমার একার নয় – মনে করি অন্যান্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রথমত, আগামি ৩১ মার্চ ২০১৩ পর থেকে আমাদের রাজ্যে 'শিক্ষার অধিকার আইন–২০০৯' পাকাপাকি ভাবে চালু হচ্ছে। কিন্তু ঐ সকল আইনের যে যে সুবিধাগুলি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাওয়ার কথা সেগুলি কবে থেকে কিভাবে পাওয়া যাবে তা এখনও পরিস্কার নয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সংযোগ নেওয়া হয়েছে। এতদিন বিদ্যুৎ বিল মেটানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১ বছরে ১০/১২ টাকা চাঁদা নিয়ে মেটানো হত। যদিও ঐ টাকায় সব মিটতো না – কিছুটা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অন্যভাবে মিটিয়ে দিতেন। বর্তমানে বিদ্যুৎ চার্জ দিনের পর যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা না নিয়ে কিভাবে মেটানো হবে? আবার প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতেও বিদ্যুৎ মাশুল কমার্শিয়াল লাইন হিসাবে ধার্য করা হয়। যেখানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনও অর্থ নেওয়া যাবে না বলা হচ্ছে সেখানে ঐ লাইন কেন 'ডোমেস্টিক' করা হবে না? আর বিদ্যুতের বিল কেন সরকার বাহাদুর মেটাবেন না?

দ্বিতীয়ত, গত ২০১১ সাল, ২০১২ সাল এবং বর্তমানে ২০১৩ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তিনরকম বয়সের নির্দেশ পাওয়া যায়। ২০১১ সালে শিক্ষাবর্ষের যে কোনও সময়ে (সাধারণতঃ জুন পর্যন্ত) ৫ বছর বয়স হলেই শিশুকে ১ম শ্রেণিতে ভর্তি করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে বিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় ১ম শ্রেণির ক্ষেত্রে ভর্তির বয়স ১ জানুয়ারিতে ৫ বছর হতে হবে। এক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় বিশালভাবে। যে সকল শিক্ষার্থীদের ভর্তির বয়স ১/২ মাস কম ছিল তাদের আগের নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয় থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাসে ৫ বছর পূর্ণ হলে ভর্তি করে নেওয়া হবে। কিন্তু হঠাৎ জানুয়ারির শেষের দিকের নির্দেশে বিদ্যালয়গুলির প্রধানেরা সমস্যায় পড়ে যান। অভিভাবকদের প্রতিশ্রুতি মতো নতুন বয়সের নির্দেশ আশায় ভর্তি করতে পারেনি। তাদের পরের বছরের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন বুঝিয়ে সুঝিয়ে। কিন্তু পরের বছর অর্থাৎ এবছর নির্দেশ আসে আরও চমৎকৃতভাবে। প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির বয়স ১ জানুয়ারিতে ৬ বছর করা হয়। ফলে ঐ শিশুটি নতুন নিয়মে এবছর প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারল না। সমস্যা বাধল অভিভাবকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকদের। এমনকি ঝগড়াও হয়ে যায় অনেক জায়গায়। প্রধান শিক্ষক নিরূপায়। এখন প্রশ্ন যাঁরা ভর্তির বয়স তিন বছরে তিনরকম করলেন সমস্যার সম্মুখীন তাঁদের হতে হলনা, সমস্যার বাস্তব পরিস্থিতি সম্মুখীন হলেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা। কেন এমন হবে? ২০১২ সালের ২ জানুয়ারি যার বয়স ৪ বছর ১১ মাস ২৯ দিন ছিল সেই শিশুটি ২০১৩ সালেও ৬ বছর পূর্ণ না হওয়ার ১ম শ্রেণিতে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করছে না। এটা কি শিক্ষার সংকোচন নয়?

তৃতীয়ত, প্রথম শ্রেণি ও নতুন প্রাক্–প্রাথমিক শ্রেণি পাঠন–পাঠনের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা থাকছে। ১ম শ্রেণির পাঠ্যবই 'আমার বই' বাড়িতে পাঠানো হবে না। অভিভাবকরা জানতে পারছেন না 'কি বই তাঁদের সন্তান পড়ছে বা বইতে কি আছে? আর প্রতিদিন ঐ সকল বই তাদের হাতে তুলে দেওয়া ও ছুটির সময় মিলিয়ে নেওয়া একটা বিশাল ঝঞ্ঝাট। যদি বলেন ১ম শ্রেণির আলাদা ঘর থাকবে সেখানে যে যার বসার জায়গায় তাদের বই থাকবে। এখানে সমস্যা কম নয় – কারণ পাঁচটি শ্রেণির জন্য পাঁচটি পঠন পাঠন কক্ষ সকল বিদ্যালয়ে নেই। আর মিড–ডে মিলের জন্য অনেক বিদ্যালয়ের কোনও না কোনও শ্রেণিকক্ষ ব্যবহার করা হয়।

চতুর্থত, প্রি প্রাইমারির ক্ষেত্রে বই ছাড়া পঠন পাঠন অনেক সমস্যায় ফেলছে। আর প্রথম ও প্রাক্ প্রাথমিকের শিক্ষক বা শিক্ষিকা অন্য শ্রেণির ক্লাস নিতে পারবেন না এও একটা সমস্যা।

পঞ্চমত, প্রথম শ্রেণির আমার বই পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে অনেক রং পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে। সেই রং কেনার খরচ কিভাবে আসবে তাও বলা হয়নি।

ষষ্ঠত, প্রাক প্রাথমিক থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৫টি শ্রেণির জন্য ৫ জন শিক্ষক ছাড়াও মিড–ডে মিল ও সর্বশিক্ষার কাগজ পত্র তৈরি সহ নানা কাজ তদারকির জন্য আলাদা একজন মোট ৬ জন শিক্ষক প্রতি বিদ্যালয়ে প্রয়োজন। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না আছে ৪র্থ শ্রেণির কর্মী না আছেন কোনও করনিক। তাহলে সুশিক্ষা কেমন করে হবে?

এছাড়া নতুন ভর্তির বয়স সরকারি বা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে যখন প্রথম শ্রেণির জন্য ৬ বছর থাকছে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ভর্তি নেওয়া হচ্ছে নার্শারিতে। তাঁদের বইপত্রও দেওয়া হচ্ছে। দুজায়গায় দুরকম নীতি থাকায় শিক্ষার বৈষম্য দেখা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তিন বছর পার হলেই একটু শিক্ষা সচেতন মানুষ বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি করাচ্ছেন। তাই অদূর ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্ভাবনা লোপ পাবে। এরকম ভাববার কারণও আছে। যেভাবে ঐ স্কুলগুলির প্রতি নাগরিকরা আস্থা হারাচ্ছেন এ কথা, বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির হার কমে যাওয়ায় তা যে কেউ বুঝতে পারবেন।

বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য শিক্ষা দপ্তরের কাছে আবেদন রাখলাম।

ধন্যবাদান্তে
তপনকুমার দাস
প্রধান শিক্ষক
হুগলী জেলা
১৬.৩.১৩

ভুল সংশোধন

সেপ্টেম্বর–ডিসেম্বর সংখ্যা অতনু সাঁই–এর 'নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণ সম্বন্ধে কিছু কথা' শীর্ষক লেখাটিতে 'নিরবচ্ছিন্ন' কথাটি ছাপার ত্রুটিতে নিরবিচ্ছিন্ন হয়েছে। অনিচ্ছকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

ওয়েবেন সংবাদ

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কার্যক্রম বিষয়ক সংবাদ

জেলা কমিটির সভা

উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সভা

গত ১৬ জানুয়ারি, ২০১৩ উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হল নেটওয়ার্কের কার্যালয়ে। সভায় রায়গঞ্জ, করণদিঘী, কালিয়াগঞ্জ ও হেমতাবাদ ব্লকের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গ্রামস্তরে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির গ্রাম ভিত্তিক তারিখ ও সময় ঠিক করা হয়। সদস্যদের গ্রাম ভিত্তিক দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। সভায় মিড–ডে মিল সংক্রান্ত সমীক্ষা পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করা হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সভা

গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছিল নেটওয়ার্কের কাঁথি কার্যালয়ে। ১৬টি ব্লকের ১৭ জন ব্লক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গ্রামস্তরে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। আগামিদিনে জেলাস্তরে সাংবাদিক, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভা

গত ৮ জানুয়ারি মথুরাপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভা আয়োজিত হয়। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচি, মিড–ডে–মিল এর সমীক্ষা, সাংগঠনিক ইত্যাদি। প্রথমে সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এরপর সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে বিষয়টি নিয়ে রাজ্য কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করবেন জেলা আহ্বায়ক। এরপর নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করেন রাজ্য সঞ্চালক। সভায় গ্রামভিত্তিক বিদ্যালয়ের নাম স্থির করা হয়। যেহেতু সময় কম তাই জেলা আহ্বায়ক–এর সঙ্গে একজন সহযোগী থাকবেন। পাথরপ্রতিমার প্রতিনিধি নিজেই সমীক্ষা করবেন। এর পরের সভা হবে আগামী ১৮ জানুয়ারি মথুরাপুরে।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভা

গত ২৫ জানুয়ারি বসিরহাটে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভা আয়োজিত হয়। এই সভার আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল – পরবর্তী নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচি, মিড–ডে মিল সমীক্ষা, অন্যান্য। সভার সভাপতি নির্বাচিত হন হাসানুজ্জামান। প্রথমে গত সভার সিদ্ধান্তপত্রটি পাঠ করেন জেলা আহ্বায়ক শ্রী সমীর বিশ্বাস। এরপর নতুন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। এরপর ব্লক অনুযায়ী নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির রিপোর্ট পেশ করেন বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা প্রতিনিধিরা। এই রিপোর্ট অনুযায়ী জেলার পরবর্তী কর্মসূচি স্থির হয়। মিড–ডে মিল সমীক্ষার জন্য বাকি থাকা বিদ্যালয়ের তারিখগুলি স্থির করা হয়। জেলার পক্ষ তথ্যগুলি থেকে রাজ্য অফিসে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠানো হবে। এরপর সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

হুগলি

হুগলি জেলা কমিটি তাদের জেলার সভা আয়োজন করেন গত ৬ ফেব্রুয়ারি মাখলা মুক্তধারার অফিসে। সভার শুরুতে জেলার গ্রাম প্রচার কর্মসূচির সাম্প্রতিক রিপোর্ট পেশ করেন জেলা আহ্বায়ক শ্রী তপন কুমার দাস এবং জেলা কমিটির সদস্য শ্রী প্রসেনজিত চ্যাটার্জী। নির্দিষ্ট ৫টি গ্রামেই অভিভাবকদের সভা হয়ে গেছে, দুটি গ্রামে কিশোরকিশোরী বাহিনীর সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর গ্রাম প্রচারের পরবর্তী কর্মসূচিগুলি ঠিক করা হয়। জেলা পরবর্তী সভা হবে আগামি মার্চ মাসে।

উত্তর ২৪ পরগণা

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির ২য় সভাটি আয়োজিত হয় স্বনির্ভরে। এই সভার আলোচ্যসূচি ছিল নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির রিপোর্ট, কেস স্টাডি এবং অভিযোগ, জেলা সম্মেলন, গ্রাম প্রচার কর্মসূচির অসমাপ্ত কর্মসূচিগুলি। এই সভার সভাপতি মনোনীত হন ফিরোরাজ আহমেদ। গত সভার মিনিটস পাঠ করেন জেলা আহ্বায়ক সমীর বিশ্বাস। ব্লক থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। সভায় স্থির হয় যে আগামি ১০ মার্চের মধ্যে জেলার রিপোর্ট ও বিলগুলি জেলা অফিসে জমা পড়বে। কয়েকটি নতুন সদস্যপদ জমা পড়েছে, অভিযোগ সংগ্রহ করার কাজ চলছে। জেলা সম্মেলনের জন্য ১১ এপ্রিল দিনটি স্থির করা হয়। এই সম্মেলনে জেলা সভাধিপতি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ্য, জেলা সমাজ কল্যান আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলা প্রকল্প আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধি, মিডিয়া, শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। জেলা সদস্যদের কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। মোট আমন্ত্রিতের সংখ্যা হবে আনুমানিক ৬০ জন। পশ্চিমবঙ্গ রাইট টু এডুকেশন ফোরাম থেকে পাওয়া ফ্লেক্সগুলি পঞ্চায়েতে লাগান হবে, ওই পঞ্চায়েতগুলি থেকে এই বিষয়ে শংসাপত্র সংগ্রহ করা হবে। জেলার পরবর্তী সভা হবে আগামি ১৯ মার্চ।

মালদহ জেলা কমিটির সভা

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভার আয়োজন করা হয়েছিল কালিয়াচক নং ব্লকের অন্তর্গত কাশিমবাজার আল আমিন একাডেমিতে। সভায় গ্রামস্তরে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির বাস্তব পরিস্থিতি সাংগঠনিক, আগামি পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা হয়। জেলার কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করতে জেলার নতুন আহ্বায়ক হিসাবে মহম্মদ সাত্তার আলিকে নির্বাচিত করা হয়। শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আগামি ৩০ মার্চ ২০১৩ জেলাস্তরে সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় মানিকচক, ২নং কালিয়াচক, কালিয়াচক এবং ইংলিশ বাজার ব্লকের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ওল্ড মালদহ এবং কালিয়াচক নং ব্লকের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভার আয়োজন করা হয়েছিল গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। কাটজুড়ি ডাঙার উইমেন অ্যাসোসিয়েশন ফর রাইটস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট–এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় গ্রাম প্রচার অভিযানের রিপোর্ট পেশ করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামি ১৭ মার্চ, ২০১৩ গান্ধী বিচার পরিষদের সভাগ্রহে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে জেলাস্তরের আলোচনার আয়োজন করা হবে। এই সভায় শিক্ষাবিদ, শিক্ষক–শিক্ষিকা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকসহ সকল স্তরের মানুষকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সভা

গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ কলকাতার সেবা কেন্দ্রে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর এক বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় গ্রামস্তরে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে জেলা প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন। প্রচারের সময় আইন প্রয়োগে যে সকল সমস্যা ও আইন লঙ্ঘনের ঘটনা নজরে এসেছে তা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছে জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রচার কর্মসূচির ভবিষ্যত কাজের সময় ও তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

শিক্ষার অধিকার আইন লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ জমা দিল ওয়েবেন

জানুয়ারি ২০১৩ ওয়েবেনের পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর এবং হুগলি জেলায় শিক্ষা অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংক্রান্ত বেশ কিছু অভিযোগ জমা দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গের রাইট টু এডুকেশন প্রোটেকশন অথরিটি (রেপা)–কে। এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের ৩টি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং ওই একই জেলার কাঁথি–১ নং ব্লকের মাজিলাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রঘুসরদারবাড় গ্রামে ৪ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বিদ্যালয় না থাকার অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে, হুগলি জেলার একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি নেওয়ার অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রেপা–র পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাইমারি) এবং হুগলি জেলার জেলা বিদ্যালয়ে পরিদর্শক (সেকেন্ডারি)–কে যথাযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য সংগঠনের সংবাদ

ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম আয়োজিত শিক্ষা অধিকার আইন সংক্রান্ত সমীক্ষা

সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম আয়োজিত শিক্ষা অধিকার আইন সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা চালিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলার মোট ২৭০টি বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৮টি সরকারি, ১৪৪টি সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত, ১৫টি বেসরকারি বিদ্যালয় আছে। পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া জেলাতে এই তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা অধিকার আইনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এর মধ্যে ১৬৩টি বিদ্যালয়ের রিপোর্ট জাতীয় স্তরে পাঠানো হয়েছে। এই সমীক্ষার রিপোর্ট লেখার কাজ চলছে, এই রিপোর্ট নিয়ে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ওকালতির কাজ করা হবে। পরবর্তীকালে এই রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যস্তরে আলোচনা সভার আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য সংগঠনের সংবাদ

গত ৬ জানুয়ারি অ্যাসোসিয়েশন অফ কনসার্ন্ড টিচার্স (অ্যাক্ট) দ্বারা আয়োজিত তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয় সংগঠনের অফিসে। সভার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সুশান্ত বসু। বিভিন্ন সংগঠন থেকে আসা প্রতিনিধিরা তাদের সংগঠনের কাজের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্পাদকের রিপোর্ট এবং আয়ব্যায়ের হিসাব পেশ করা হয়। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব উঠে আসে। এরপর অধ্যাপক মৃণ্ময় ভট্টাচার্য পরবর্তী কার্যকলাপ এবং কি কি বাধা আছে সেগুলি আলোচনা করেন। সম্পাদকীয় রিপোর্ট অনুমোদিত হয়। অধ্যাপক মুরারী প্রসাদ ভট্টাচার্য অ্যাক্টের নতুন সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হন। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

ক্রাই পাটনার্স মিট

২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ, ২০১৩ প্রতি বছরের মত এবছর ক্রাই তাদের সহযোগী সংগঠনগুলির জন্য চারদিনব্যাপী বার্ষিক সভার আয়োজন করেছিল কলকাতায়। প্রথম দুদিন সংগঠনগুলির মধ্যে কিভাবে কাজ করা হয় এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময় হয়। এর সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে দলগত আলোচনা করা হয় এবং পরবর্তী কর্মসূচি স্থির করা হয়। পরের দুইদিন শিশু সুরক্ষা নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলে আই.পি.এস দেবাশিস বড়াল যিনি কিশোর ন্যায়বিচার (যত্ন ও সুরক্ষা) আইন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও পাচার নিয়ে বক্তব্য রাখেন মউ ভট্টাচার্য। সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প দিয়ে বক্তব্য রাখেন ইন্দুপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। ক্রাই–এর পক্ষে থেকে ক্রাই এর পরবর্তী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন অতীন্দ্রনাথ দাস, সত্য গোপাল দে।

সিনির ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

১ ফেব্রুযায়ী সিনির (চাইল্ড ইন নিড ইন্সস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় কলকাতার টাউন হলে। এই অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা শিশু শ্রমিক বিষয়ে একটি সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করা হয় সিনির পক্ষ থেকে। এরপর বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষ তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

পরিযায়ী শিশুশ্রমিকদের সুরক্ষার নতুন নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্যোগ

নারায়ণতলা মাস্ কমিউনিকেশন সোসাইটির উদ্যোগে গত ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ বিধাননগরের ইকমার্ড (ICMARD)–এ পরিযায়ী শিশুশ্রমিকদের সামাজিকভাবে মূলস্রোতে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। বিশেষতঃ ভিন রাজ্য থেকে ইট ভাটায় কাজ করতে আসা শিশুশ্রমিকদের মূলস্রোতের যুক্ত করতে গিয়ে যে যে সমস্যার সামনে তাঁদের পড়তে হয় সেই বিষয়েই তাঁরা আলোকপাত করেন। বেশ কিছু ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কথাও শোনা যায়। সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এই কর্মরত পরিযায়ী শিশুদের সুরক্ষার নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনের সম্মিলিত কাজের জন্য একটি নেটওয়ার্ক গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে আলোচনা সভায়। সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা নেটওয়ার্ক গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

বিদ্যালয়ে শাস্তি ও শ্রেণিকক্ষে শিশুদের আচরণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা

মন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ বিদ্যালয়ে শাস্তি ও শ্রেণিকক্ষে শিশুদের আচরণ সমস্যা নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজির শিক্ষক পার্থপ্রতিম সরকার এবং ইতিহাসের শিক্ষিকা চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজন বক্তাই দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তারা মনে করেন, শাস্তি দিয়ে কোনো ভাল পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাঁদের মতে শাস্তি দেওয়ার পেছনে ক্ষমতার সম্পর্ক কাজ করে। ছোটদের মনের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করা দরকার। শিক্ষকের কাজ শিশুকে শিখতে সাহায্য করা। সাহায্যকারী কখনও শাস্তি দিতে পারে না। শিক্ষক–শিক্ষিকাদের ওপরেও নানা চাপ থাকে। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে একসাথে নজর না দিলে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হলে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

রাজ্যের শিশু সুরক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

সম্প্রতি জাতীয় শিশু সুরক্ষা আয়োগের সদস্য নীনা নায়েক রাজ্যের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে রাজ্যের শিশু সুরক্ষার বাস্তব পরিস্থিতি ও সমস্যা নিয়ে এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। গত ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সিনি আশার কলকাতা কার্যালয়ে এই আলোচনাসভায় শিশু সুরক্ষা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিরা উদাহরণ সহযোগে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বীরভূম জেলায় জুভেনাইল জাস্টিস আইন অনুযায়ী কোনো হোম নেই। সাধারণ ভাবে হোমগুলির পরিস্থিতি ভাল নয়। শিশুবান্ধবতো নয়ই। বহু শিশুশ্রমিক নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত রয়েছে। শিশু বিবাহ, শিশু পাচারের সমস্যা ও পুলিশের অভিযোগ না নেওয়ার কথাও আলোচনায় উঠে আসে। জনগণনায় যুক্ত না হওয়া শিশুদের কথাও উপস্থিত প্রতিনিধিরা তুলে ধরেন। শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কেও নীনা নায়েক জানতে চান। তিনি লিগাল সার্ভিস অথরিটির সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

খরচ বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার মান

সংবাদ সংকলন ঃ ভাল হওয়া দূরে থাক, যত দিন যাচ্ছে, শিক্ষার মান ততই খারাপ হচ্ছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বুধবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম যে আর্থিক সমীক্ষা পেশ করেছেন, সেখানে এই উদ্বেগজনক ছবিটা স্পষ্ট হয়েছে। অথচ স্কুলের সুযোগসুবিধা আগের তুলনায় বেড়েছে, ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির হারও বেড়েছে, শিক্ষকদের সংখ্যাও বেড়েছে, পড়েছে শুধু শিক্ষার মান। আর্থিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০১১–তে পঞ্চম শ্রেণির ৪৬.৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণির পড়া বলতে পারত না। ২০১২–তে এসে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২.৩ শতাংশে।

অঙ্কের আতঙ্কটা আরও বেশি। ২০১০ সালে খুব সাধারণ অঙ্ক, যেমন দুই সংখ্যার বিয়োগ করতে পারত না পঞ্চম শ্রেণির ২৯ শতাংশ পড়ুয়া। ২০১২–তে সেটা আরও বেড়ে হয়েছে ৪৬.৫ শতাংশ। গ্রামে তিন চতুর্থাংশ পড়ুয়াই সাধারণ যোগ–বিয়োগ করতে পারেনা। তাবে রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক ও কেরল ব্যতিক্রম।

ইংরাজীর আতঙ্কও তাড়া করছে পড়ুয়াদের। গ্রামের পঞ্চম শ্রেণির প্রায় ৪৯ শতাংশ পড়ুয়া কেবল ইংরাজী শব্দ পড়তে পারে, মাত্র ২২.৫ শতাংশ সহজ ইংরাজী বাক্য পড়তে পারে। অষ্টম শ্রেণির ৪৭ শতাংশ পড়ুয়া ইংরাজী সহজ বাক্য পড়তে পারে।

অথচ, সর্বশিক্ষা অভিযানে শুধু শিক্ষা নয়, ভাল মানের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। গত বাজেটে সর্বশিক্ষা অভিযানের জন্য ২৫ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। স্কুলে মিড–ডে মিল দেওয়া হচ্ছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের ফলে অবশ্য স্কুলে ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে, শিক্ষক–পড়ুয়া অনুপাত আগের তুলনায় ভাল হয়েছে। শৌচাগারহীন স্কুলের সংখ্যা কমে ৮.৫ শতাংশ হয়েছে।

পাশাপাশি এও জানা গেছে গ্রামাঞ্চলে বেসরকারি স্কুলে বাচ্চাদের পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ এই সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াবে ৫০ শতাংশে।

শিক্ষা কোনও ভিক্ষা নয়

তাপস জানা, পূর্ব মেদিনীপুর

‘‘ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুর অন্তরে’’ কবির ভাষায় আজকে যারা শিশু আগামিদিনে তারা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এই সত্যটা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না, অথচ আমাদের দেশে শিশুদের প্রতি অবহেলা ক্রমবর্ধমান। একটি শিশু বড় হয়ে ওঠে প্রথম তার পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু যে পরিবারের বাবা মা নিজেরা খেতে পরতে পারার অর্থ উপার্জন করতে পারে না, যাঁদের নিরাপত্তা নেই, তারা কীভাবে তাঁদের শিশুদের নিরাপত্তা দিতে পারে। অধিকাংশ শিশুদের শৈশব কখন আসে আর কখন যায় তা বলা যায় না। তাদের না আছে পড়াশুনার সুযোগ, না আছে বিনোদনের সুযোগ, তাদের দুবেলা দুমুঠো খাবার জোটে না, জোটে না ভালো পোষাক পরিচ্ছদ ও আদর যত্ন। সারা বিশ্বে শিশুদের স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতা আছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন বা এই জীবন দর্শনে স্থির ছিলেন যে সাক্ষরতা, সচেতনতা ও শিক্ষা ব্যতিরেকে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। দেশের মানুষের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বহর দেখে কবি অত্যন্ত ব্যাথিত হয়েছেন। তাই তিনি লিখিত ভাবেই ঘোষণা করেছেন, ‘‘শিক্ষা সংস্কার ও পল্লী সঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ’’। শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমেই পল্লী সঞ্জীবন সম্ভব এই ভাবনায় তিনি ভাবিত। তাই সেই ভাবনার ফলিত রূপ আমরা দেখতে পাই শ্রী নিকেতনকে কেন্দ্র করে বয়স্ক শিক্ষা, বিধিমুক্ত শিক্ষা, চেতনাবৃদ্ধির কর্মসূচি। বিধিবদ্ধ শিক্ষার আয়োজনও তিনি করেছেন শ্রী নিকেতন এবং শান্তিনিকেতনে।

শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনা ছিল। শিক্ষার মধ্যে বস্তু পরিচয়, কর্মসাধন, সংগীত, শিল্পের যোগ থাকবে, থাকবে ‘‘আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ,’’ তাঁর মনের মধ্যে এই চিন্তা দৃঢ়ভাবে কাজ করেছে যে, আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা শুধুই বিষয়শিক্ষা, যা ‘‘মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ঝরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না’’। সেই জন্যই আমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হলেও ‘‘প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিণতির শক্তি প্রাচুর্য জন্মে না’’।

সমাজের এক অংশের মানুষ শিক্ষার সুযোগ পাবেন আর এক অংশের মানুষ তা থেকে বঞ্চিত থাকবেন এই বাস্তব অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। তাই এ ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনায় প্রকাশ দেখি এই বাক্যে – ‘‘যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ থাকে শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত’’। এই বাক্যে থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই সমাজ দর্শনকে প্রকট করে যে শিক্ষার সুযোগ বা অধিকার থাকবে প্রতিটি মানুষের । ভারতের সনাতন মূল্যবোধ ও শিক্ষা চিন্তার সঙ্গে তাল রেখে আশ্রমী পরিবেশ, প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রেখে শিক্ষাদান করা ভাল। শিক্ষা যেন ভীতিকর না হয়। আত্মবিকাশের স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যেন আনন্দযজ্ঞের পীঠস্থান হয়ে উঠে এই ছিল তাঁর ভাবনা।

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যে মানুষকে তার উৎকর্ষতা এবং উন্নতির দিকে সঠিকভাবে চালনা করে শিক্ষা। তবে ‘শিক্ষা’ শব্দটির আবহমান অর্থকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর ভাবনায় ‘‘প্রকৃত শিক্ষার ধারনা কিন্তু এখনো আমাদের উদিত হয় নাই। আমি কখনো কোন কিছু সংজ্ঞা নির্দেশ করিনা । তথাপী এই ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নয়, আমাদের বৃত্তিগুলির শক্তিসমুহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। স্বামীজির ভাবনায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় কেননা সেই শিক্ষা কখনোই একজন মানুষকে মৌলিক ভাবসম্পন্ন হিসেবে তৈরি করতে পারে না। যুগোপযোগী হয়ে ওঠা শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, সেই প্রেক্ষিতে বলেন – ‘‘এই চাই স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ান, চাই কারিগরি বিদ্যা, আর যাহাতে শিল্প বাড়ে, লোকে চাকরি না করিয়া যাহাতে কিছু উপার্জন করিতে পারে। এই পৃথিবীতে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তার সবটুকুই আমাদের ভিতরেই রয়েছে। কোন জ্ঞানই আমাদের বাইরে নেই। আমাদের মধ্যেই জ্ঞানসমূহকেই শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন।’’

শিক্ষা মানুষকে সত্যের ধারনার দিকে এগিয়ে দেয়, তাকে অন্তরে বাহিরে শক্তিশালী করে তোলে। এই প্রসঙ্গেই নারী শিক্ষার প্রসারে তার অনন্ত উৎসাহ ছিল। নারীজাতিকে তিনি কখনোই উৎপাদন যন্ত্র হিসাবে দেখতেন না। তাঁর ধারনায় যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণ হন তাদের ঘরেই বড় মানুষ জন্মায়। শিক্ষার মাধ্যমেই নারীজাতিকে অবদমনের হাত থেকে বাঁচানো যাবে এবং সমগ্র মানুষজাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়া যাবে। মেয়েদের আগে তুলতে হবে। জনসাধারণকে জাগাতে হবে, তবে তো দেশের কল্যান – ভারতে কল্যান।

শিক্ষার মাধ্যমে নারীজাতির সমস্ত গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্ভব, তবে শিক্ষা যদি ধর্মহীন হয় তাহলে সেই গলদপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা কখনই স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারবে না। স্ত্রী শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই শরীর–পালন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতিভেদের বাধাকে বিবেকানন্দ সর্বাগ্রে সরাতে চেয়েছিলেন। যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক, কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে। অর্থাৎ চন্ডালের বিদ্যাশিক্ষা যত আবশ্যক ব্রাহ্মনের তত নহে। যদি ব্রাহ্মনের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক চন্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক। কারণ যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবে প্রখর করেন নাই। তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। কেবল শিক্ষা, শিক্ষা বাহিরে শিক্ষা দ্বারা যদি হৃদয়স্বরূপ গ্রন্থ খুলিয়া যায়, তবেই তাহার কিছু মূল্য আছে – বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল হৃদয়স্পর্শ, হৃদয়মূখী যা সমাজে মূল্যবোধ, দায়িত্ব কর্তব্য, সামাজিকভাবে ভারসাম্য ছিল। প্রাণী অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সামাজিক শিক্ষা থাকা উচিত। সামাজিক শিক্ষা যদি না থাকে তাহলে সমাজে বৈষম্য তৈরি হয়। শিক্ষা হলে মানুষের মধ্যে আচার আচরন বোধ সমাজের হিংসা, বিছিন্ন বৈষম্য থাকবে না। সমাজের ঐক্যবোধ গড়ে উঠবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ভারসাম্য গড়ে উঠবে।

বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা কি, সমাজে উপযোগী, যদিও উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি। তার এক শ্রেণির কাছে শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবপোযোগী নয়। সামাজিকভাবে পাশ করা। যা মুখস্থ বিদ্যার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা পরিবেশ দেখতে পাই। এটা কি বাস্তবমুখী শিক্ষা।

বাস্তবমুখী শিক্ষার কি উপযোগী শিক্ষা পরিবেশ রয়েছে। তা সকলে আমরা জানি প্রতিটি শিশুর মৌলিক শিক্ষা পাবে। ভারতবর্ষে সংবিধানে ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে – ‘‘শিক্ষা প্রতিটি শিশুরই অধিকার’’। আবার ২৯ নং ধারায় বলেছে – গুণগত মানের শিক্ষা প্রতিটি শিশুরই অধিকার যা তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে সহায়ক এবং যা শিশুকে অন্যের অধিকার, মূল্যবোধ এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে ও তার সম্মান করতে শেখায়।

এই অধিকার থাকা স্বত্বেও নানা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৮৫–র মে মাসে শিক্ষানীতি সংক্রান্ত বিলটি সংসদের উভয় সভায় অনুমোদন লাভ করে। একেই বলা হয় ‘‘জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬। পরবর্তী কালে ১৯৯০ সালে রামমূর্তি এবং

১৯৯০ সালে জনার্দন রেড্ডির কমিটির মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৯৯৩ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী অর্জুন সিং পার্লামেন্টে প্রস্তাব পেশ করেন। একে বলা হয় – National Policy on Education Revised Policy Formation - 1992। পরে অন্ধ্রপ্রদেশের জনৈক অধিবাসী উন্নকৃষ্ণন সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল তাঁর বাড়ির কাছে কোনও স্কুল না থাকায় ছেলেকে লেখা পড়া শেখাতে পারছেন না। বিচারক জীবনরেড্ডি ৫ জন বিচারকের সহায়তায় মামলার রায় দেন। তিনি ভারতীয় সংবিধানের ৩ নং পরিচ্ছেদের (মৌলিক অধিকার) ২১ নং অনুচ্ছেদের সাথে (নির্দেশাত্বক নীতি) ৪৫ নং অনুচ্ছেদে মেলবন্ধন করেন এবং বলেন শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে। এটা তাদের মৌলিক অধিকার। এর পরই ২০০১ সালে দেশব্যাপী সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয়।

এরপর ২০০৮ সালে শিশুর শিক্ষার অধিকার আইনের খসড়া বিল তৈরি হয়। ২০০৯ সালে ২০ জুলাই রাজ্যসভা এ ৫ আগষ্ট লোকসভায় The Right of Children to Free and Compulsory Education Act - 2009 পাস হয়। মাননীয় রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে স্বাক্ষর করেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ সালে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এপ্রিল মাস থেকে শিশু শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনটি কার্যকর হয়। ভারতবর্ষে ৮৫তম সংবিধান সংশোধনে (জম্মু কাশ্মীর বাদে) ভারতবর্ষে প্রতিটি রাজ্যে ১ এপ্রিল ২০১০ সাল থেকে শিক্ষা অধিকার আইন লাগু হয়। এর পর গত ১৬ মার্চ ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি নিয়মাবলী West Bengal Right of Children to Free and Compulsory Education Rules 2012 নামে চিহ্নিত হয়।

তার পরেও ২ বছর অতিক্রম করেছে। বিদ্যালয় স্তরে রাজ্যস্তরে নিয়মাবলীর কোন কাজ হয়নি। কেন্দ্রীয় বিল তো কার্যকরী করা তো দূরের কথা, রাজ্যস্তরে নিয়মাবলী কার্যকরী করার ক্ষেত্রে, রাজ্যের বিদ্যালয়ে কোন ভূমিকা নেই। এক দিকে রাজ্যে আইন, আর অন্য দিকে রাজ্যের কার্যকরী ভূমিকায় অনীহা। এই যদি ব্যবস্থাপনা চলে তাহলে শিক্ষার গুণগতমান কতটা হওয়া উচিত।

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থা, যা – গুরু দক্ষিণা দিয়ে শিক্ষা পেত, ছাত্র, শিক্ষক – শিক্ষা বান্ধব, শিক্ষা মর্যাদা, শ্রদ্ধা মর্যাদা, সম্মান, দায়িত্ব, কর্তব্য বোধ, মূল্যবোধ সমাজে প্রতিফলিত হত।

বর্তমান ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, শিক্ষকের পেশায় অনীহা, ছাত্রের ভক্তি নেই, অভিভাবকের গুরুত্বহীন, তার মাঝে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সব পরিবার – মানুষ, মানুষকে শ্রদ্ধা ভক্তি থেকে ভুলে গেছে। অপর দিকে সরকারের কর্মসূচি রূপায়ণে নানা সমস্যা, বাধা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বদিচ্ছার অভাব।

ফলে আগামিদিনে শিক্ষা যে ভারতবর্ষে উচ্চ পর্যায়ে যাবে তা ভাবা অস্বাভাবিক, শিক্ষার উন্নয়নসূচক যদি শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্যারামিটার ধরা হয় তাহলে বলতেই হবে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার র‍্যাঙ্ক ২০০৫–২০০৬ সালে ৩২ নম্বর। উচ্চ শিক্ষা র‍্যাঙ্ক ৩৩ নম্বর। যেখানে ২০০৯–১০ সালে প্রাথমিকে ২৪ নম্বর, উচ্চ শিক্ষায় ২৬ নম্বর তা কিছুটা উন্নতি করেছে। সেই তুলনায় পিছিয়ে পড়া রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে।

আসুন সকলে মিলে সচেষ্ট, দায়িত্ব, কর্তব্য, মূল্যবোধ, সামাজিক শিক্ষাকে সমাজে উচ্চ আসনে নিয়ে যেতে সক্ষম হই এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। সব শিশু গুণগত শিক্ষা পাবে। বেসরকারি ভাল শিক্ষা পাক, কিন্তু সরকারি, আধাসরকারি শিক্ষা সমান গুণগত শিক্ষা পাবে। এর জন্য সরকার, অভিভাবক, পরিবেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এদের ৪টি ভূমিকা অতুলনীয়। শিক্ষা কোনও ভিক্ষা নয়''। শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার।

হুগলি জেলার কয়েকটি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যার সচিত্র প্রতিবেদন –

হুগলি জেলার কাপাসহাঁরিয়া অক্ষয় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং খরসারাই ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের পরিকাঠামোগত বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। কাপাসহাঁরিয়া অক্ষয় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কাপাসহাঁরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীর না থাকায় নিয়মিত সমস্যা দেখা যায়। বালিকাদের আলাদা শৌচাগার নেই, মিড–ডে–মিলের রান্নাঘরের অবস্থা শোচনীয়।

খরসারাই ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ১৫০ বছরের পুরানো শ্রেণিকক্ষগুলির ভগ্নপ্রায় দশা। জেলাস্তরে বারবার আবেদন সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের ভগ্নদশা – খরসরাই ফ্রি প্রাইমারি স্কুল

শৌচালয়ের ভগ্নদশা

পাশাপাশি প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় – অক্ষয় প্রাথমিক ও কাপাস হারিয়া হাইস্কুল

শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনা

শৈশব, শিক্ষার অধিকার ও পালা গান

শর্মিষ্ঠা বারিক, বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লাকের গোটসাউরি গ্রামে। গোটসাউরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। বাবার সাথে পালা গানে যেতে হয় গান ও অভিনয়ের জন্য। বাবা হারমোনিয়াম বাজান। শর্মিষ্ঠা আর ওর দিদি সুমনা গান করে, নাচ করে। ষষ্ঠী মঙ্গল, মনসা মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, লক্ষ্মীর বনবাস– এইসব পালা গানে রাতের পর রাত জেগে নেচে ও গান গেয়ে অভিনয় করতে হয়। ষষ্ঠী মঙ্গল রাত নটায় শুরু হয়ে শেষ হতে সকাল হয়ে যায়। সব পালা গানেই রাত ভোর হয়ে যায়। কালিকা মঙ্গল আট দিন ধরে চলে। পা ব্যাথা হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে আসলে মা মলম মাখিয়ে দেয়। শর্মিষ্ঠা যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে তখন থেকেই এই পালা গানে যুক্ত হয়েছে। বাবা মালিক, সব টাকা বাবাই নেন। শ্রোতা–দর্শকরা ওদের গান শুনে খুশি হয়ে পুরস্কার হিসেবে যে টাকা দেন সেই টাকা শর্মিষ্ঠা বা ওর দিদির হাতে আসে। সেই টাকাও কখনও কখনও বাবা দাবি করেন। মা তখন ওদের পক্ষ গ্রহণ করে। পুরস্কারের টাকা জমিয়ে ওর ছোটো বোনের অন্নপ্রাশনে পায়ের তোড়া ও কানের দুল তৈরি করে দেবে বলে ঠিক করেছে শর্মিষ্ঠা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ গোটসাউরি গ্রামে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে প্রচারের সময় আরও অনেক শিশুর সাথে শর্মিষ্ঠা স্লোগান দিচ্ছিল, ''শিক্ষা ভিক্ষা নয়, শিক্ষা আমাদের জন্মগত অধিকার – এই অধিকার দিতেই হবে।''

প্রচারের পর গোটসাউরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এক জনসভাতে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনার সময় শর্মিষ্ঠা এবং ওর বাবা নারায়ন চন্দ্র বারিক দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে ঠিক হয় শিক্ষকদের সাথে গ্রামবাসী ও অভিভাবকরা গ্রামের স্কুল ছুট শিশুদের পরিবারের সাথে কথা বলবেন তাদের বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু শর্মিষ্ঠার মতো শিশুদের যাদের অভিভাবকদের সাথে রোজগারের কাজে যাবার কারণে বিদ্যালয়ে নাম থাকলেও রোজ বিদ্যালয়ে আসতে পারে না তাদের কী হবে?

শিক্ষা অধিকার আইন ও কিছু বাস্তব পরিস্থিতি

উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদিঘী ব্লকের মোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে ৫০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছিল। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের কর্মীদের হস্তক্ষেপে এই টাকা নেওয়া বন্ধ করা হয়।

এই জেলায় শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে প্রচারের সময় শিক্ষা অধিকার আইন লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। যেমন, রায়গঞ্জের পার্বতী সুন্দরী গার্লস হাইস্কুল সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর নতুন ক্লাসে ভর্তির সময় ৪৫০ টাকা নিয়েছে। রায়গঞ্জ ব্লকের সুভাষগঞ্জে পঞ্চম শ্রেণি, ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোনো রসিদ না দিয়ে ৩০০ টাকা নেওয়া হয়েছে। করণদিঘী ব্লকের লাহুতোড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পিপলা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ গিয়ে দেখা গেল এখনও পর্যন্ত বই দেওয়া হয়নি। পার্শ্ববর্তী গ্রামে ধারলাডাঙ্গি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে জানা গেল দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা চতুর্থ শ্রেণি উত্তীণ ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য ৫০ টাকা করে নিয়েছেন। সাবধান হাই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির সময় ২০০ টাকা এবং নতুন শ্রেণিতে ভর্তির সময় ১০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। এই স্কুলে গত তিন বছর ধরে পরিচালন কমিটির নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে মিড–ডে মিল বন্ধ রয়েছে। কোনও লাইব্রেরী নেই। অফিস ঘরে আলমারিতে কিছু বই থাকলেও তা ব্যবহার হয় না। এই স্কুলের পাশেই রয়েছে সাবধান জুনিয়ের বেসিক স্কুল। এই স্কুলে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা ৩০০–র বেশি। ২ জন পার্শ্বশিক্ষক এবং ৩ জন সহ শিক্ষক। পরিবেশ শিশুবান্ধব তো নয়ই। অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে পাশের বাড়ির জামা–কাপড় মেলে রাখা আছে। পরিচ্ছন্ন শৌচাগার নেই, নোংরা অবস্থায় তালা বন্ধ রয়েছে।

বিদ্যালয় ছুট শিশু আবার বিদ্যালয়ে

শিক্ষক শিক্ষিকাদের মারের ভয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দেগঙ্গা ব্লকের কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলসুর গ্রামের পুজা মন্ডল। কলসুর গ্রামে স্বনির্ভর সংগঠনের প্রজেক্ট অফিস কলসুর গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্রে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে এক আলোচনাসভা চলাকালীন ২০০৯ – সভায় উপস্থিত এক ব্যক্তি পুজার বিষয়টি সভার নজরে আনেন। স্বনির্ভর সংগঠনের কর্মী শুভঙ্কর ভাবক পুজা ও তার অভিভাবকদের সাথে কথা বলে আবার স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে পুজা আনন্দের সাথে নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কিছু অভিজ্ঞতা

অষ্টমী সরদার, পিতা শ্রী রনজিৎ সরদার, গ্রাম–মাকালতলা, পোষ্ট–পৃথীবা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। অষ্টমী সরদার গত ২০১১–১২ শিক্ষা বর্ষের পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে পারে নি। সে বয়রাগাছি ইউনাইটেড ইনস্টিটিউশনের স্কুলের ছাত্রী ছিল। এর পর থেকে সে আর নিয়মিত স্কুলে যেত না। স্কুলের নাম করে বাড়ি থেকে বের হত কিন্তু স্কুলে না গিয়ে ঘুরে ফিরে বাড়ি চলে আসত। এই সময় ওয়েবেনের সদস্যরা ওকে বিকাশ কেন্দ্রের হোমে ''আনন্দকেন্দ্রে'' নিয়ে আসার চেষ্টা করেন এবং স্কুলে যাওয়া বা পড়া শোনার ব্যাপারে বোঝানোর চেষ্টা করেন।

গত ১৫ এপ্রিল, ২০১২ অষ্টমী আনন্দ কেন্দ্রে আসে। সদস্যরা তাকে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন। অবশেষে তারা আটঘরা হাইস্কুলে ১১ জানুয়ারি, ২০১৩ ওকে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করেন। এই সময়ের আগে ও স্কুলে না গেলেও বাড়িতে পড়াশুনো করতো। বর্তমানে ওর নিজস্ব মতামত হলো–ওর এখন স্কুলে যেত ভালো লাগছে এবং ভালো করে পড়াশুনো করতে চায়। ভবিষ্যতে বড় হতে চায়। পড়াটা যাতে ওর কাছে বোঝা বলে মনে না হয় সেইভাবে তৈরি করার চেষ্টা চলছে।

৩.৩.২০১৩ বিকাশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পঞ্জীতে স্কুলছুট ছাত্র ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এক সমীক্ষার আয়োজন করা হয়। পঞ্জী মামুদপুরের স্কুল সংলগ্ন পাড়া, পঞ্জী কাহার পাড়া ইত্যাদি গ্রামে কেবল স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। এখানকার দুজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, সেখানে স্কুলছুট ছাত্র ছাত্রী নেই বললেই চলে।

২৪.০২.২০১৩ বিকাশ কেন্দ্র থেকে বিকাশকেন্দ্রের কর্মী এবং আনন্দ কেন্দ্রের ছাত্রদল আটঘরা কাহার পাড়াতে, মালপাড়াতে এবং সন্নিহিত গ্রামে স্কুলছুট ছাত্র ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এক সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষাতে কাহার পাড়াতে একজন এবং মাল পাড়াতে ৪ জন ছেলে মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের প্রত্যেককেই স্কুলে ভর্তি করানো বা আবার স্কুলে যাওয়ার কথা বলা হয়। এই ব্যাপারে স্থানীয় আটঘরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

স্কুলছুট ছাত্র ছাত্রীদের বৈশাখী মন্ডলের কাগজপত্র ওয়েবেনের সদস্যদের আমাদের কাছে আছে। চতুর্থ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হতে চেয়েছিল। কিন্তু তার অভিভাবককের অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষকে ২০০ টাকা ভর্তি ফি বাবদ না দিতে পারার জন্য তাকে ভর্তি করাতে পারেনি।

কাহার পাড়াতে স্কুলছুট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কমছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিশু শিক্ষা

তপন কুমার দাস

ইংরেজ শাসকরা ভারত ছেড়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতের জাতীয় সরকার খুব কম সময়ের মধ্যে কয়েকটি শিক্ষা কমিশন বসিয়ে তাদের সুপারিশগুলি নিয়ে আলোচনা–পর্যালোচনা করেছেন। অবশেষে প্রায় ১৭ বছর পার করে ১৯৬৪ সালে ডঃ ডি. এস. কোঠারীর নেতৃত্বে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর ঐগুলি নিয়ে সারাদেশ ব্যাপী আলাপ আলোচনা শুরু হয়। বহু ঘাত প্রতিঘাতের পর ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুনা সেনের পরিচালনায় ও সহযোগিতায় একটি জাতীয় শিক্ষানীতি স্থির হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভাতেও ঐ শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করা হয়। মোট ১৭টি ধারা সম্বলিত এই শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত ভারতের শিক্ষার ধরণধারনের একটা সাধারণ চিত্র প্রস্ফুটিত হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রথম শর্তই ছিল সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা। সংবিধানের ৪৫ নং ধারায় নির্দেশ ছিল ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হবে। এতদিন ধরে শিক্ষার যে অপচয় ও অনুন্নয়ন চলে আসছে তা বন্ধ করতে হবে।

তাছাড়া শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর জন্য শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার উপর নজর দেওয়া হবে। তাঁদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, যোগ্যতা বৃদ্ধি ও গবেষণার সুযোগ বাড়াতে হবে। সারাদেশে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকেও অবহেলা না করে তাদের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা হবে। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

শিক্ষার সুযোগ–সুবিধা বন্টনের মধ্যে সমতা আনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। আঞ্চলিক অসাম্য দূর করে গ্রামাঞ্চলে ও অনগ্রসর অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এছাড়া সামাজিক বিকাশ, পাঠক্রম, বৃত্তিশিক্ষা, সর্বাধুনিক পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য ও একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য হল শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার থাকবে। শিক্ষার একটি ন্যূনতম স্তর পর্যন্ত জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার সুযোগ থাকবে।

এই শিক্ষানীতির পরবর্তী অংশে শিশুকল্যান ও শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেক শিশুর সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করা একান্ত কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে Early Childhood Care and Education কর্মসূচি গঠন করা হয়। এখানে প্রাক্–প্রাথমিক শিক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্তরের শিক্ষাকে 'শিশুকল্যাণ ও শিক্ষা' কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যকর করার কথা বলা হয়। আর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয় (১) প্রাথমিক শিক্ষায় ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষা এবং তা সম্পূর্ণ করার কথা (২) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা। ঐ দুটি উদ্দেশ্য যাতে পূর্ণ হয় সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। প্রত্যেকটি স্কুলে অন্ততপক্ষে সকল ঋতুতে ব্যবহৃত হবে এমন দুটি বড় ঘর থাকবে ও কমপক্ষে দুজন শিক্ষক থাকবেন। আরও শিক্ষাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে নানা শিক্ষা উপকরণ থাকবে। আর এই কর্মসূচির বাস্তব রূপায়নের প্রচেষ্টাকে বলা হয় – 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড'। আর যে সকল ছেলেমেয়েরা ১৪ বছরের মধ্যে যে কোনও কারণে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তাদের জন্য থাকবে 'প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা' (Non formal Education)। ঐ শিক্ষার পাঠক্রম জাতীয় পাঠক্রমের সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হবে। ১৯৯৫ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়ে যাতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৮৬ সালে জাতীয় শিক্ষানীতির বিলটি সংসদের উভয় সভায় গৃহীত হয়। শিক্ষানীতি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংহতি কতটা দানা বাঁধল, মানুষের মধ্যে কতটা ধর্ম নিরপেক্ষতা বোধ সৃষ্টি হল তার পরিমাপের কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

শিশুর শিক্ষা কোন বয়স থেকে শুরু হবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। কখনও সরকার ঠিক করে দেয় পাঁচ বছর পার হলে তবেই সে ফরমাল বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত আবার তা ২০১৩ সাল থেকে ছয় বছর অতিক্রম করলেই তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার উপযুক্ত বলে নির্দেশ করা হয়েছে। তাহলে শিশুটি ৬ বছর বয়সের আগে কি করবে? আমরা কিন্তু দেখেছি ২/৩ বছর বয়স থেকেই শিশুদের পিঠে বইয়ের বোঝা এবং জলের বোতল হাতে ঝুলিয়ে মা বাবার অঙ্গনওয়াড়ী বা আই সি ডি এসে থালাবাসন নিয়ে যেতে। সেখানে গরীব সন্তানদের পুষ্টির সঙ্গে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে।

শেষাংশ পরের সংখ্যায়

---

১ পাতার শেষাংশ.... সন্ধান পাওয়া যায়। আশার কথা ৪টি গ্রামে কোনও বিদ্যালয় ছুট শিশু নেই। (সব জেলার বিস্তারিত তথ্য আগামী সংখ্যা প্রকাশিত হবে)।

আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কম্াপলসারি এডুকেশন রুলস, ২০১২–এর ৫ নং রুল অনুযায়ী সার্কেল রিসোর্স সেন্টারে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিশুদের জন্ম থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তথ্য রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা। সে কাজ যে যথার্থ ভাবে হচ্ছে না তা বিদ্যালয় ছুট শিশুর সংখ্যা থেকেই পরিস্কার।

গ্রামস্তরে প্রচারের সময় স্বেচ্ছাসেবকদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় আইন সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের সচেতনতার অভাব রয়েছে। আইনে উল্লেখিত পরিকাঠামো বেশির ভাগ বিদ্যালয়েই এখনও গড়ে ওঠেনি। শিশু বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার কোনও উদ্যোগও চোখে পড়ছে না। বেশ কিছু বিদ্যালয়ে এখনও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই।

নেই ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শৌচালয়, থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা ব্যবহার যোগ্য নয়। গ্রন্থাগার নেই, খেলার মাঠ নেই, প্রাচীর নেই।

আইন ও বাস্তব পরিস্থিতির এই বিস্তর ফারাকের বিষয়ে গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ, বিদ্যালয় ছুট সংক্রান্ত তথ্য এবং বিদ্যালয় পরিকাঠামো বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সাথে আলোচনা করে শিক্ষা অধিকার আইন যথাযথ প্রয়োগের দাবি জানানো হবে।

গ্রামস্তরে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে প্রচারের সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ যথেষ্ট আশাজনক। আগামী দিনে এই আইন যথাযথ প্রয়োগে আরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করবেন, এই আশা করা যেতেই পারে।

সুস্মিতা চন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান : ৩ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য